**পবিত্র আশুরার মাহাত্ম্য, করণীয় ও বর্জনীয়**

মুসলিম উম্মাহর জন্য আশুরা একটি তাৎপর্যময় ও গুরুত্ববহ দিন। মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিবছর পবিত্র আশুরা পালিত হয়। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৬১ হিজরির এই দিনে অন্যায় ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ইসলামের শেষ নবি হজরত মুহাম্মদের (সা.) দৌহিত্র হজরত ইমাম হুসাইন (রা.) চক্রান্তকারী ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে ফোরাত নদীর তীরে কারবালার প্রান্তরে মর্মান্তিকভাবে শাহাদতবরণ করেন। বিশ্বের মুসলমানদের কাছে দিনটি একদিকে যেমন শোকের, তেমনি হত্যা ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার চেতনায় উজ্জ্বল।

ইসলামের ইতিহাসে কারবালার এ শোকাবহ ঘটনার আগেও এই দিনে নানা তাৎপর্যময় ঘটনা ঘটেছে। বর্ণিত আছে, ১. আল্লাহতায়ালা এই দিনে আকাশ-জমিন, পাহাড়-পর্বতসহ সমস্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং সর্বপ্রথম বৃষ্টি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। ২. আদি মানব হজরত আদমকে (আ.) এই দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনেই তিনি পৃথিবীতে আগমন করেন, এদিনই তার তওবা কবুল করা হয় এবং এই দিনে তিনি স্ত্রী হাওয়ার (আ.) সঙ্গে আরাফার ময়দানে সাক্ষাৎ লাভ করেন। ৩. হজরত ইউনুছ (আ.) এই দিনে ৪০ দিন পর মাছের পেট থেকে আল্লাহর রহমতে মুক্তিলাভ করেন।

৪. এদিনই হজরত নূহের (আ.) নৌকা মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পেয়ে তুরস্কের জুদি নামক পর্বতে নোঙর করে। ৫. হজরত ইব্রাহিম (আ.) নমরুদের প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ৪০ দিন পর সেখান থেকে ১০ মহররম মুক্তিলাভ করেন। ৬. দীর্ঘ ১৮ বছর কঠিন রোগে ভোগার পর হজরত আইয়ূব (আ.) দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করেন। ৭. হজরত ইয়াকুবের (আ.) পুত্র হজরত ইউসুফ (আ.) তার ১১ ভাইয়ের ষড়যন্ত্রে কূপে পতিত হন এবং পরবর্তীকালে দীর্ঘ ৪০ বছর পর ১০ মহররম পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করেন। ৮. হজরত ইদ্রিস (আ.) এই দিনে সশরীরে জান্নাতে প্রবেশ করেন। হজরত মূসা (আ.) এই দিনে তাওরাত কিতাব লাভ করেন, ফেরাউনের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন এবং এই দিনে অভিশপ্ত ফেরাউনকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়।

৯. হজরত দাউদ (আ.) আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা লাভ করেন এবং বিশেষ সম্মানে ভূষিত হন এই দিনে। ১০. হজরত সুলায়মান (আ.) তার হারানো রাজত্ব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়েছিলেন এই দিনে। ১১. পবিত্র আশুরার দিনে ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া শিশু মুসাকে (আ.) গ্রহণ করেন। ১২. এই দিনে হজরত ঈসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেন এবং তার জাতির লোকেরা তাকে হত্যাচেষ্টা করলে আল্লাহ্ পাক তাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে মুক্তিদান করেন। ১৩. কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসাইন (রা.) পরিবার-পরিজনসহ শাহাদতবরণ। এ ছাড়া হাদিস শরিফে উল্লেখ রয়েছে, মহররম মাসের ১০ তারিখ আশুরার দিনেই কেয়ামত সংঘটিত হবে।

ইসলামের ইতিহাসে ১০ মহররম তারিখটির নানা গুরুত্ব ও তাৎপর্য থাকলেও কারবালায় ঘটে যাওয়া সর্বশেষ মর্মান্তিক ঘটনার স্মরণেই বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানরা দিনটি পালন করে থাকেন। ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়, হজরত আমিরে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াজিদ অবৈধভাবে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেন এবং এজন্য ষড়যন্ত্র ও শক্তি ব্যবহারের পথ বেছে নেন। চক্রান্তের অংশ হিসাবে মহানবি হজরত মুহাম্মদের (সা.) আরেক দৌহিত্র হজরত ইমাম হাসানকে (রা.) বিষপান করিয়ে হত্যা করা হয়। একই চক্রান্ত ও নিষ্ঠুরতার ধারাবাহিকতায় ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ হয়ে পরিবার-পরিজন ও ৭২ জন সঙ্গীসহ শাহাদতবরণ করেন হজরত ইমাম হুসাইন (রা.)।

তাদের হত্যার ক্ষেত্রে যে নির্মম-নিষ্ঠুর পথ বেছে নেওয়া হয়েছিল, ইতিহাসে এর নজির বিরল। অসহায় নারী ও শিশুদের পানি পর্যন্ত পান করতে দেয়নি ইয়াজিদ বাহিনী। বিষাক্ত তীরের আঘাতে নিজের কোলে থাকা শিশুপুত্র আলী আসগরের মৃত্যুর পর আহত অবস্থায় অসীম সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে শহিদ হন হজরত ইমাম হুসাইন (রা.)। আশুরার এ ঐতিহাসিক ঘটনার মূল চেতনা হচ্ছে ক্ষমতার লোভ, ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য চক্রান্ত ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই।

হজরত ইমাম হুসাইনের (রা.) উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাস্তব জীবনে অনুসরণ করাই হবে এ ঘটনার সঠিক মর্ম অনুধাবনের বহিঃপ্রকাশ। অন্যায় ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান ও ত্যাগের যে শিক্ষা কারবালা মানবজাতিকে দিয়েছে, তা আজকের দুনিয়ার অন্যায় ও অবিচার দূর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

আশুরার দিনে অনেক আম্বিয়ায়ে কিরাম আল্লাহ্ পাকের সাহায্য লাভ করেন এবং কঠিন বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি লাভ করেন। এ সাহায্যের শুকরিয়া হিসাবে নবি-রাসূলরা এবং তাদের উম্মতরা এই দিনে রোজা পালন করতেন। যেহেতু আশুরার দিনটি অত্যন্ত পবিত্র ও তাৎপর্যময়, তাই এই দিনে উম্মতে মুহাম্মদী হিসাবে বিশেষ নেক আমল করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। মহররম মাসে তথা মহররমের ১০ তারিখে (পবিত্র আশুরার দিন) রোজা রাখা সম্পর্কে অনেক বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) মদিনায় আগমন করে দেখতে পেলেন, ইহুদিরা আশুরার দিনে রোজা রাখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, তোমরা এই দিনে রোজা রাখো কেন? তারা বলল, এ অতি উত্তম দিন, এই দিনে আল্লাহতায়ালা বনি ইসরাইলকে তাদের শত্রুর কবল থেকে নাজাত দান করেন, ফলে এই দিনে মুসা (আ.) শুকরিয়া আদায়স্বরূপ রোজা রাখতেন। আল্লাহর রাসূল বললেন, আমি তোমাদের অপেক্ষা মুসার অধিক নিকটবর্তী। এরপর তিনি এই দিনে নিজেও রোজা রাখলেন এবং উম্মতদের রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন (সহিহ্ মুসলিম : ১১৩০, সহিহ্ বুখারি : ৩৯৪৩)।

সাহাবায়ে কিরাম এই দিনে তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও রোজা রাখতে অভ্যস্ত করতেন। বিখ্যাত সাহাবি হযরত রুবায়্যি বিনতে মুয়াবিয (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আশুরার দিন সকালবেলা আনসারদের এলাকায় লোক মারফত এই সংবাদ পাঠালেন-যে আজ সকালে আহার করেছে, সে যেন সারাদিন আর না খায়। আর যে সকালে খায়নি, সে যেন রোজা পূর্ণ করে। ওই নারী সাহাবি বলেন, এরপর থেকে আমরা নিজেরাও এই দিনে রোজা রাখতাম এবং আমাদের সন্তানদেরও রোজা রাখাতাম। তাদের জন্য আমরা খেলনা বানিয়ে রাখতাম। তারা খাবারের জন্য কান্নাকাটি করলে তাদের খেলনা দিয়ে শান্ত করতাম। ইফতার পর্যন্ত এ নিয়ে তাদের সময় কেটে যেত (সহিহ্ মুসলিম : ১১৩৬, সহিহ্ বুখারি : ১৯৬০)।

তবে নবি করিম (সা.) ১০ মহররমের সঙ্গে ৯ বা ১১ মহররম আগে-পিছে মিলিয়ে দুটি রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) যখন আশুরার রোজা রাখছিলেন এবং অন্যদের রোজা রাখতে বলেছিলেন, তখন সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, এই দিনকে তো ইহুদি-নাসারারা সম্মান করে। নবিজি এ কথা শুনে বললেন, ইনশাআল্লাহ্ আগামী বছর আমরা নবম তারিখেও রোজা রাখব। বর্ণনাকারী বললেন, এখনো আগামী বছর আসেনি। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা.) ইন্তেকাল হয়ে যায় (সহিহ্ মুসলিম : ১১৩৪)।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আশুরার দিনে আপন পরিবার-পরিজনের মধ্যে ভালো খাবারের ব্যবস্থা করবে, আল্লাহতায়ালা পুরো বছর তার রিজিকে বরকত দান করবেন (তিবরানী শরিফ : ৯৩০৩)।

আমাদের এ উপমহাদেশের সাধারণ মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে মহররম মাস সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা রয়েছে। যেমন-এ মাসে জমিতে হাল-চাষ না করা, মাটি না কাটা, বাঁশ-ঘাস-কাঠ ইত্যাদি না কাটা, বিয়েশাদি না করা, নতুন ও সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ না পরা, সাদা অথবা কালো কাপড় তথা শোকের পোশাক পরা, নতুন ঘরবাড়ি নির্মাণ না করা, গোশত না খাওয়া ও নিরামিষ আহার করা, কোনো শুভ কাজ বা ভালো কাজের সূচনা না করা, সব ধরনের আনন্দ-উৎসব পরিহার করা, কোনো আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে না যাওয়া। এসবই কুসংস্কার; কুরআন-হাদিসের সঙ্গে এর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।

পরিশেষে বলা যায়, মহররমের শিক্ষা হলো অন্যায়-দুরাচারের বিরুদ্ধে আদর্শিক সংগ্রাম পরিচালনা করা। জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের অকুতোভয় লড়াইয়ের সাহস সঞ্চার করা। তাই বিশ্ব মুসলিমের কাছে উদাত্ত আহ্বান, আসুন এ পবিত্র দিনে ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সচেষ্ট হই এবং ইমাম হুসাইনের (রা.) আদর্শকে বুকে ধারণ করে অন্যায়-জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই।